গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৪ - ২০ আগস্ট, ২০১৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

বিদ্যুৎ বিল-২০১৪

জনস্বার্থেই প্রতিরোধ করতে হবে

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর ভারতের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে বিশ্বায়ন নীতির পরিপূরক নয়া অর্থনীতি বা খোলা বাজার অর্থনীতি চালু হওয়ার পরে সমস্ত সেক্টরেই আইন পরিবর্তন বা নয়া আইন প্রবর্তন শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিদ্যুৎ বিভাগেও বিদ্যুৎকে পণ্যে পরিণত করে জাতীয় এবং বিদেশি শিল্পপতিদের মুনাফার মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আইন পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেই পরবর্তী বিজেপি সরকার 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' চালু করে।

বিজেপি এই আইনের প্রবর্তক হলেও কংগ্রেস, বিজেপি থেকে শুরু করে সিপিআই (এম) পর্যন্ত অর্থাৎ সব পার্লামেন্টারি দলই এই আইনকে সমর্থন জানিয়েছিল সেদিন। এস ইউ সি আই (সি) দল বলেছিল, এই বিদ্যুৎ আইন প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎকে পরিষেবা বা উন্নয়নের মাধ্যম থেকে পরিবর্তন করে বহুজাতিক সংস্থা এবং দেশীয় শিল্পপতিদের হাতে মুনাফা লুণ্ঠনের মাধ্যম হিসাবে তুলে দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। তখন থেকেই আমরা এই জনবিরোধী আইনকে বাতিল করার জন্য আন্দোলন করে চলেছি। গত ৭ এপ্রিল পুনরায় দিল্লিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা বিক্ষোভ জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই জনস্বার্থবিরোধী আইনটি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

সর্বহারার মহান নেতা আমাদের শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়ে গিয়েছেন যে, বিশ্বপুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান তৃতীয় সংকটের যুগে ওদের সংকট হল এবেলা-ও বেলার সংকট। কোনও আইন কোনও নীতিই আর পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে সংকট থেকে মুক্ত করতে পারবে না। এই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়কের চিন্তাকে ভিত্তি করে আমাদের দল দেখিয়েছিল যে, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-ই শেষ নয়, বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে আরও জনস্বার্থবিরোধী আইন আসবে। তাই বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল করে জনস্বার্থমুখী গণতান্ত্রিক আইন চালু করার দাবিকে শক্তিশালী করতে হবে। পার্লামেন্টারি ডান-বাম রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতালিপ্সার ফলে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ আইন

দুয়ের পাতায় দেখুন

হরিয়ানায় নির্মাণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ

২৭ জুলাই এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ভবন নির্মাণ কারিগর মজদুর ইউনিয়নের ডাকে শত শত শ্রমিক রোহটকে কালেক্টরেট অফিসে বিক্ষোভ দেখায় (সংবাদ আটের পাতায়)

কেতুগ্রামে ছাত্রী হত্যা ও ক্যানিংয়ে ত্রাণশিবিরে ধর্ষণের প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রিট অবরোধ

কেতুগ্রামে ছাত্রীকে গুলি করে ছাত্রী হত্যা ও ক্যানিংয়ে ত্রাণশিবিরে গণধর্ষণের প্রতিবাদে ডিএসও-ডিওয়াইও-এমএসএসের পক্ষ থেকে ৭ আগস্ট কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট অবরোধ

বন্যা দুর্গত মানুষ এখনও ত্রাণ পাচ্ছে না

সর্বদলীয় সভায় এস ইউ সি আই (সি)

আজ দক্ষিণবঙ্গের ১২টি জেলার মানুষ বন্যায় গভীর সংকটে পড়েছে। সংবাদে প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী ৮১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৫৫টি মিউনিসিপ্যালিটি, ৪টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ২৩৫টি ব্লক, ১৭৫৪৬টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ৮৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩৭৪ জন মানুষ বন্যা কবলিত, মৃতের সংখ্যা ৯৭ , নষ্ট হয়েছে ৯ লক্ষ ৪৫ হাজার হেক্টর জমির চাষ। এই রিপোর্ট ৬ আগস্ট পর্যন্ত। এর পরে এই সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে। অথচ রাজ্য সরকার সম্প্রতি বলেছে যে বন্যা পরিস্থিতি সরকারি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আজকের এই সভা সত্যিকার অর্থেই সর্বদলীয় হওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ বিধানসভায় প্রতিনিধি থাকুক বা না থাকুক সকল রাজনৈতিক দলকেই ডাকা উচিত ছিল। কেবলমাত্র পরিষদীয় দলের নেতৃত্বকে ডেকে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমান বন্যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে এমন বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা জানা থাকলেও তা মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রাজ্য সরকার গ্রহণ করেনি। সংবাদমাধ্যম থেকে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব জানতে পারলেও সরকার রিলিফ কী দিচ্ছে তা আমরা জানতে পারছি না। এলাকা থেকে যে সংবাদ পাচ্ছি তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প এবং তা বণ্টনের ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য, দুর্নীতি, চূড়ান্ত দলবাজি হচ্ছে। দু-একটি উদাহরণ আপনার দৃষ্টিগোচর করছি। উত্তর ২৪ পরগণায় ২ লক্ষ মানুষ বন্যার কবলে পড়ে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে সরকারি বরাদ্দ চাল ১ হাজার কুইন্টাল এবং ত্রিপল ৫৪৫০টি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর এবং কুলতলী ব্লক নদীবহুল ও সুন্দরবন এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এখানে হাজার হাজার ভেঙে পড়া বাড়ি সংস্কারের পরিকল্পনা হচ্ছে না, ত্রিপল দেওয়া হয়েছে খুবই সামান্য। সরকারি দপ্তর থেকেই এই তথ্য জানা

ছয়ের পাতায় দেখুন

৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের সমাবেশ

বিদ্যুৎ বিল ২০১৪-কে প্রতিরোধ করতে হবে জনস্বার্থে

একের পাতার পর

২০০৩ বাতিলের আন্দোলন করে গেলেও সে দাবি আজও আদায় করা সম্ভব হয়নি। আবার বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফার আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে উত্তরোত্তর। পাল্টেছে রেগুলেশন। মাশুল বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। চালু হয়েছে এম ভি সি এ অর্থাৎ মাল্টিলি ভেরিয়েবল কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট রেগুলেশন। যার মূল কথা হল বিদ্যুৎ মাশুল নিয়ন্ত্রণের অধিকার বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া। ওদের খুশিমতো বিদ্যুতের মাশুল বাড়বে। বেড়েছে বিদ্যুতের দাম তরতরিয়ে। মাশুল বেড়েছে চার বছরে ১২ বার। হয়েছে ৪.২৭ টাকা থেকে ৬.৯৫ টাকা। এতেও বিদ্যুৎ ব্যবসায়ী সহ বিনিয়োগকারীদের ইচ্ছাপূরণ না হওয়ায় আনা হয়েছে বিদ্যুৎ বিল-২০১৪। পার্লামেন্টারি সব পার্টির ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই জনস্বার্থবিরোধী বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই বিলকে পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে পাঠিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার লোক ঠকাতে গণতন্ত্রের ঠাট বজায় রেখে বিজেপির সাংসদ কিরিট সোমাইয়াকে চেয়ারম্যান করে ১৪ জন বিজেপি সাংসদ, সিপিএমের এম বি রাজেশ, তৃণমূলের সাংসদ সৌমিত্র খান, কংগ্রেসের দীপেন্দ্র হুদা সহ ৫ জন, সমাজবাদী পার্টি, এ আই ডিএম কে, বহুজন সমাজ পার্টি প্রমুখ দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটির মতামত নিয়ে বিলটি আইনে পরিণত হতে চলেছে। পার্লামেন্টারি কমিটি তাদের মতামত সহ বিলটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, চলমান বাদল অধিবেশনেই বিদ্যুৎ বিল ২০১৪ বিদ্যুৎ আইন ২০১৫ হিসাবে পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে আইনে রূপ নেবে।

কী আছে এই বিদ্যুৎ বিলে এবং পার্লামেন্টারি কমিটির বক্তব্যে? সে বিষয়ে খুব সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

এই কমিটি তাদের অনুমোদন পত্রে বলেছে — "The commitee notes that the concept of segregation of carriage and content is the soul of the Electricity (Ammendment) Bill, 2014. This will help in clearly identifying the technical and commercial losses as hitherto the technical losses are usually accounted to the network business while commercial losses to supply business."

"The committee also feel that some incentives may be provided to the states who take lead in the implementation of segregation of carriage and content." অর্থাৎ এই বিদ্যুৎ বিল ২০১৪ (সংশোধনীর) প্রাণসত্তাই হল বণ্টন ও সরবরাহকে বিভাজন করা। কারণ, এর ফলে কারিগরি লোকসান এবং বাণিজ্যিক লোকসানের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। বাণিজ্যিক লোকসান সরবরাহ ব্যবসার সাথে যুক্ত আর কারিগরি লোকসান হল সংবহন-বণ্টন ব্যবসার সাথে যুক্ত। পার্লামেন্টারি কমিটি প্রস্তাবগুলো সমর্থন জানিয়ে এই প্রক্রিয়াকে পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা বলে বলেছে, যে রাজ্য এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেবে তার জন্য incentives বা পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এরপর বলা হয়েছে "The Bill proposes the creation of intermediatory company, This means an entity succeeding to the exisitng power purchase agreements and procurement agreements of the relevant distribution licensees on reorganization...." এর পর রয়েছে "After interaction with the various stakeholder on the Bill a new provison has been inserted to section 14 regarding franchisee, ...that franchisee shall not be required to obtain any separate licence from appropriate commission."

সেকশন১৪-তে ফ্র্যাঞ্চচাইজি তৈরির কথা বলে বলা হয়েছে এই ফ্রাঞ্চচাইজি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছ থেকে কোনও লাইসেন্স না নিয়েই ব্যবসা করতে পারবে। অর্থাৎ এই ফ্রাঞ্চচাইজিগুলির উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

বিলে বলা হয়েছে "initiation of suomotu proceedings for the purpose of tariff determination... This has ostensibly been proposed due to non-filing of pititions by the state Discom." রাজ্যে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো সময়মতো মাশুল বৃদ্ধির জন্য আবেদন না করলে বা মাশুল নির্ধারণের জন্য আবেদন না করলে কমিশনের আইনি অধিকার বলে, নিজেই মাশুল নির্ধারণ করে দিতে পারবে। এই মাশুল নির্ধারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "The constituents as reflected in the tariff policy for determining the tariff should be evaluated objectively and the benefit of improvements on return of investment, equity norms, depreciation, cost of debt should be passed on to customers."

নিরবচ্ছিন্নভাবে কোম্পানিগুলোর লাভ যাতে বৃদ্ধি পায় কমিশনকে সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে। বিনিয়োগের টাকা ফেরত, ইক্যুইটি রিটার্ন, সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি, অনাদায়ী ইত্যাদি বিষয়গুলোর সবটাই গ্রাহকদের ঘাড়ে চাপাতে হবে। আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, "Proposed ammendment in section 61D providing for recovery of cost of elelctriciy without any revenue deficit." সরকার সেকসন ৬১ডি সংশোধন করে বলতে চাইছে যেন প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায়ের ক্ষতি না করে বিদ্যুতের খরচ তোলার ব্যবস্থা করা হয়। "To ensure the better future of Discoms some mechanism should be put in place for realization of their dues by liquidating the regulatory assets." কোম্পানিগুলির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য রেগুলেটরি অ্যাসেট যাতে না থাকে তা দেখতে হবে।

এর পরে বলা হয়েছে "The commitee observe that there have been encouraging response from most of the states on the idea of segregation of carriage and content." পার্লামেন্টারি কমিটি মনে করে বেশিরভাগ রাজ্য সরকারই এই বিভাজনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেছে।

বিদ্যুতের দাম কমানোর দাবিতে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির (অ্যাবেকা) নবান্ন অভিযান

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, বিদ্যুৎ বিল ২০১৪-র উদ্দেশ্য হল (১) বণ্টন কোম্পানিকে বিভাজন করে দু'টি অর্থাৎ বণ্টন ও সাপ্লাই কোম্পানি করা হবে, (২) মধ্যবর্তী একটি কোম্পানি থাকবে যার কাজ হবে বিদ্যুৎ কেনা ও বিক্রির ব্যবস্থা করা, (৩) সাপ্লাই কোম্পানির অধীনে থাকবে অনেকগুলি ফ্র্যাঞ্চাইজি, যেগুলির কোনও লাইসেন্স লাগবে না, (৪) ট্যারিফ নির্ধারণের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে ঃ (ক) কোনও মতেই যেন লাইসেন্সি বা কোম্পানির লোকসান না হয় তা দেখতে হবে, (খ) বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের রিটার্ন, ইক্যুইটি নর্ম অর্থাৎ ১৬.৫ রিটার্ন, ক্ষয়ক্ষতি বকেয়া ইত্যাদির দায় গ্রাহকদেরই বহন করতে হবে, (৫) রেগুলেটরি অ্যাসেট রাখা চলবে না, অর্থাৎ একসাথে অনেকটা মাশুল বৃদ্ধি না করে খানিকটা জমিয়ে রেখে ধীরে ধীরে আদায় করা চলবে না, (৬) যদি কোনও কোম্পানি কোনও বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাশুল বৃদ্ধির জন্য আবেদন না করে তা হলে কমিশন নিজেই সেই মাশুল নির্ধারণ বা বৃদ্ধি করে দেবে, (৭) এই বিভাজন পরিকল্পনাকে পশ্চিমবঙ্গ সহ প্রায় সব রাজ্য সরকারই সমর্থন করেছে।

২০১৪ বিলটি পার্লামেন্টের অনুমোদন পেলে এই বিভাজনের মাধ্যমে বাজার সংকটে ভুগতে থাকা মাঝারি পুঁজির মালিকরাও কিছুটা ব্যবসা করতে পারবে। এর ফলে মাশুল আরও ব্যাপক হারে বাড়তে বাধ্য। বিনিয়োগের টাকা ফেরত, সকলের ক্ষেত্রে ইক্যুইটি-নর্ম, রেগুলেটরি অ্যাসেট না থাকা— ইত্যাদির মাধ্যমে মাশুল বৃদ্ধি হবে ব্যাপকতর, অপর দিকে লাইসেন্সবিহীন ফ্র্যাঞ্চাইজির হাতে তুলে দেবার ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টা হয়ে পড়বে নিয়ন্ত্রণহীন। অর্থাৎ বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা। রাজ্য সরকার বা কোনও কোম্পানি মাশুল বাড়াতে না চাইলেও কমিশন নিজেই সুয়োমোটো করে মাশুল নির্ধারণ করে দেবে। কোনও কারণেই কোম্পানির যাতে লোকসান না হয় তা দেখবে কমিশন। এই বক্তব্যের মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কার হয়েছে যে, এই বিল বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থেই নিয়ে আসা হয়েছে। এই বাদল অধিবেশনে বিলটি পাশ হলে যাবে রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই জনস্বার্থবিরোধী বিলকে প্রতিরোধ করতে হবে আমাদের।

এই প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার সময় খুব গুরুত্ব দিতে হবে নেতৃত্বের প্রশ্নটিকে। দেখা যাচ্ছে, যে সব রাজনৈতিক দলের জন্যই বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ চালু হতে পেরেছে, চালু হতে চলেছে বিদ্যুৎ বিল-২০১৪, যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গোয়েঙ্কা মাশুল বাড়াতে সক্ষম হয়েছে এবং হচ্ছে— সমস্যার তীব্রতা এবং জনসাধারণের এ বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তারাই বিড়াল-তপস্বী সেজে আজ বর্ধিত মাশুল কমানোর কথা বলে সংবাদপত্রে ফটো তুলে প্রচার চালাচ্ছে। সেই সব শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য জনসাধারণের সমস্যার সমাধান নয়, তাদের উদ্দেশ্য হল আগামী নির্বাচনে ফায়দা লোটা। এদের সম্পর্কে সচেতন থেকে সঠিক আপসহীন নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি থানার পার্টি কর্মী কমরেড মদন মোহন গরাঁই বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘ রোগভোগের পর ৪ জুলাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। কমরেড মদন গরাঁই ছয়ের দশকে যুক্তফ্রন্টের আমলে স্থানীয় নেতৃত্বের সংস্পর্শে এসে দলের সাথে যুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। অসুস্থ অবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে দলের কাজ না করতে পারলেও মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তিনি দলের নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে দলের খবরাখবর নিতেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দলের কাজকর্ম করার জন্য কর্মীদের উৎসাহিত করতেন। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে স্থানীয় কমরেডরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড মদনমোহন গরাঁই লাল সেলাম

কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্য কৃষকদের সম্পর্কে নির্মম উদাসীনতার নজির

সাধারণ মানুষের জীবন-মরণ, ভালো-মন্দের প্রশ্নে সব সরকারই যে নির্মমভাবে উদাসীন, বিজেপি-কংগ্রেস বা আঞ্চলিক দলগুলির নেতাদের মধ্যে এ ব্যাপারে যে কোনও ফারাক নেই, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কৃষিমন্ত্রী তা আবার প্রমাণ করলেন। দেশজুড়ে কৃষক-আত্মহত্যার ঘটনা যখন অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে, কংগ্রেস বিজেপি নির্বিশেষে কেন্দ্রের একের পর এক সরকারের আর্থিক নীতিই যে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী, তা যখন দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার, তখন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিং সরকারের দায় ঝেড়ে ফেলতে এই মৃত্যুর জন্য কৃষকদের ড্রাগের নেশা, প্রেমে ব্যর্থতা, যৌন অক্ষমতা প্রভৃতিকে দায়ী করলেন।

কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্যে সারা দেশের মানুষ বিস্মিত। কৃষিমন্ত্রী, যাঁর উপর সারা দেশের কৃষকদের ভালোমন্দের দায়িত্ব, তিনি এমন অশোভন, দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলতে পারেন, তা তাঁরা ভাবতেও পারেননি। কিন্তু মন্ত্রীর এ হেন কথায় প্রধানমন্ত্রী বা বিজেপি নেতাদের বিস্মিত হতে দেখা গেল না। প্রধানমন্ত্রী কথায় কথায় দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁর দরদের কথা ফলাও করে বলতে ভালোবাসেন। বলেন, ছোটবেলায় নাকি তিনি চা বিক্রি করেছেন, তিনি নাকি দরিদ্র কৃষকের কষ্টের কথা জানেন, অথচ ঋণের ফাঁদে সর্বস্বান্ত কৃষকদের সম্পর্কে এমন কুরুচিকর কথা বলে তাদের অপমান করা সত্ত্বেও তিনি রাধামোহন সিংকে একটি বাক্যেও নিন্দা করলেন না। বললেন না, কৃষির মতো দপ্তরের দায়িত্বে থেকে এমন কথা উচ্চারণ করা মানে দেশের সমস্ত কৃষককেই অপমান করা, যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য কৃষকরা দলে দলে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করা। বোঝা যায়, বক্তৃতা দিয়ে হাততালি কুড়োতে এঁরা যতখানি দড়, মানুষ হিসাবে ততখানিই নিচু মনের। তাই নিন্দা দূরের কথা, বিজেপি নেতারা মন্ত্রীর বক্তব্য সমর্থন করে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, কৃষিমন্ত্রী আসলে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এন সি আর বি)-র দেওয়া তথ্য উদ্ধৃত করেছেন।

এন সি আর বি-র দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ২০১২ সালে ১৩,৭৫৪ জন, ২০১৩ সালে ১১,৭৭২ জন এবং ২০১৪ সালে ৫,৬৫০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু '১২ সালের ১৩,৭৫৪ জনের মধ্যে মাত্র ১,০৬৬ জন নাকি কৃষি-সংকটের জন্য আত্মহত্যা করেছেন, বাকিরা সবাই প্রেম-ভালোবাসা থেকে শুরু করে সামাজিক সমস্যার শিকার। একইভাবে ২০১৩তে মাত্র ৮৯০ জন কৃষকের এবং '১৪তে মাত্র ১৪০০ জন কৃষকের মৃত্যুর জন্য কৃষি-সংকট দায়ী করা হয়েছে। এন সি আর বি একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা। মূলত রাজ্য সরকারগুলির অধীন পুলিশ কোনও মৃত্যু সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেয় এন সি আর বি তাকেই নথিভুক্ত করে। যেমন, এন সি আর বি-র রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে ২০১২ সাল থেকে কোনও কৃষক-আত্মহত্যার ঘটনাই ঘটেনি। রাজ্যের মানুষ জানেন, গত মরশুমে শুধু আলু চাষিদের মধ্যেই ১৬ জন আত্মহত্যা করেছেন। ধান সহ কৃষির অন্যান্য ক্ষেত্রের আত্মহত্যার কথা ধরলে এই সংখ্যা আরও বাড়বে। প্রধানমন্ত্রীর দল বিজেপিও এ রাজ্যে বিরোধী হওয়ায় কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে সরব। অথচ এ রাজ্যে কৃষক-আত্মহত্যার কোনও উল্লেখ এন সি আর বি রিপোর্টে নেই। কারণ রাজ্যের তৃণমূল সরকার নিজেদের দায় এড়াতে এই মৃত্যুর কোনওটিকেই কৃষিসংকট জনিত কারণে বলে মানেনি। ফলে পুলিশ রিপোর্টেও তার কোনও উল্লেখ নেই। অন্য রাজ্যগুলিও এখন কৃষক-মৃত্যুর সংখ্যা কম করে দেখাতে এই একই কৌশল নিয়েছে। ফলে সরকারি রিপোর্টে কৃষক-আত্মহত্যার সংখ্যা কমছে, যা বাস্তব চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এন সি আর বি-র এ হেন রিপোর্টকেই কৃষিমন্ত্রী সংসদে গড়গড় করে পড়ে গেছেন। কৃষক-আত্মহত্যার সংখ্যা যদি কম করে দেখানো যায় তবে সেই আত্মহত্যা বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়ও সরকারের থাকে না। অর্থাৎ, মৃত্যুকে ঠেকানো নয়, মৃত্যুর দায় এড়ানোটাই কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব। এ রাজ্যে পূর্বতন সিপিএম সরকার বা কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের আমলেও মন্ত্রীরা কৃষকদের আত্মহত্যা সংক্রান্ত যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তাতেও বিজেপি মন্ত্রীর মতো একই ধরনের কারণই উল্লেখ করেছিলেন। বিজেপি নেতারা আজ কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্যের সাফাই গাইতে গিয়ে ইউ পি এ আমলের মন্ত্রীদের বক্তব্যকে নজির হিসাবে টানছেন। বিজেপি-কংগ্রেস নেতাদের পরস্পরের বক্তব্যই প্রমাণ করে উভয় সরকারের নীতির যেমন কোনও ফারাক নেই, তেমনই জনসাধারণ সম্পর্কে তাঁদের অসংবেদনশীল মনোভাবের মধ্যেও কোনও ফারাক নেই। আসলে এই সব দলগুলির নেতাদের কাছে রাজনীতিটা কোনও হৃদয়বৃত্তি নয়। দেশজুড়ে মানুষের অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য তাঁরা রাজনীতিতে আসেননি। রাজনীতিটা তাঁদের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা, ক্ষমতার অংশীদার হওয়া, আরাম-আয়েস, অর্থ রোজগারের উপায় মাত্র। তাই এই প্রতিটি মৃত্যু তাঁদের মনের মধ্যে কোনও তোলপাড় তোলে না, বিবেকের কাছে প্রশ্ন তোলে না যে, নেতা হিসাবে, মন্ত্রী হিসাবে এই মৃত্যুর জন্য তাঁদেরও দায় কতখানি। এই মৃত্যু তাঁদের কাছে নিছক একেকটি সংখ্যা মাত্র। সেই সংখ্যা যত কম করে দেখানো যায়, ততই তাঁদের কৃতিত্ব। ভোটবাজ দলগুলির নেতাদের এই মনোভাবের জন্যই স্বাধীনতার এত বছর পরেও কৃষক মৃত্যুর কোনও বিরাম নেই।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আজও কৃষি-নির্ভর। স্বাধীনতার পর থেকে একের পর এক সরকার এসেছে অথচ কৃষকদের জন্য অবহেলা ছাড়া আর কিছু জোটেনি। কৃষকদের আত্মহত্যা চলছিলই। নব্বইয়ের দশকে কংগ্রেসের নেওয়া 'উদারিকরণ' নীতির পর থেকে আত্মহত্যার সংখ্যা লাফ দিয়ে বেড়েছে। ১৯৯৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই ২০ বছরে ভারতে ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৪৪০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। অর্থাৎ প্রতি ৩০ মিনিটে একজন কৃষক আত্মহত্যা করছেন। কেনই বা তা না হবে? আজও দেশের অর্ধেকের বেশি জমিতে সেচের কোনও ব্যবস্থা নেই, চাষিদের তাকিয়ে থাকতে হয় আকাশের দিকে। খরা এবং বন্যা চাষিদের নিত্যসাথী। সার বীজ কীটনাশক সবই একচেটিয়া পুঁজির মালিক আর বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কব্জায়। তারা ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে চলেছে। দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। সার প্রভৃতিতে ভরতুকি কমতে কমতে আজও যতটুকু টিকে আছে তা শেষ পর্যন্ত কৃষকের হাতে গিয়ে পৌঁছায় না। কৃষকরা যাতে তাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে ফলানো ফসলের ন্যায্য দাম পায় তার কোনও ব্যবস্থা কোনও সরকার করেনি। সরকার চাইছে ফুড-কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলোর হাতে এই বাজার তুলে দিতে। সহায়ক মূল্যে লাভজনক দাম দিয়ে ফসল কেনা বা স্টেট ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে বিপণনের ব্যবস্থা করলে এই মতলব সফল হবে না। তাই ন্যূনতম লাভজনক দাম না পেয়ে ধান, আলু ও পাট চাষিরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। হাজার হাজার গম, তুলো, আখচাষি আত্মহত্যা করছে। দেশের চিনিকলগুলির মালিকরা আখচাষিদের পাওনা ২১ হাজার কোটি টাকা মেটায়নি। এদের মধ্যে আছে বাজাজ, বিড়লা, মোদি গোষ্ঠী এবং মদ উৎপাদকদের অন্যতম শিরোমণি পন্টি চাড্ডার মালিকানাধীন ওয়েভ গোষ্ঠী। তার জন্য কোনও চিনিকলের মালিককে কিন্তু সরকার গ্রেপ্তার করে চাষিদের টাকা মেটাতে বাধ্য করেনি। বলেনি, দরিদ্র চাষিকে শোষণ করে তোমার মুনাফার পাহাড় আরও উঁচু করা চলবে না। এরপরও কি বুঝতে অসুবিধা হয় এই সরকারগুলো কাদের স্বার্থ রক্ষা করছে! এই শিল্পপতিরাই তো দেশটা চালাচ্ছে। কংগ্রেস-বিজেপি থেকে শুরু করে ভোটবাজ দলগুলি তো তাদের টাকাতেই চলে। তাদের ঠিক করে দেওয়া নীতিই তো পার্লামেন্টে আইন আকারে পাশ হয়। তাই কৃষকরা যখন লাখে লাখে আত্মহত্যা করে, সরকার তাদের বাঁচার কোনও ব্যবস্থা করে না, কিন্তু মন্দার ধাক্কায় পুঁজিপতিদের মুনাফা কমে গেলে তৎক্ষণাৎ তা পূরণ করে দিতে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ভরতুকি দেয়। ফলে এটা খুবই স্বাভাবিক, কৃষকদের আত্মহত্যার আসল কারণ যে সরকারের পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী, কৃষকস্বার্থবিরোধী নীতি, তা পুঁজিপতিদেরই টাকায় জিতে আসা কৃষিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা বিজেপি নেতারা উচ্চারণ করতে পারেন না। আমলাদের তৈরি যা হোক একটা রিপোর্ট তাঁদের তোতা পাখির মতো গড়গড় করে পড়ে যেতে হয়, যা দেশের গোটা কৃষক সমাজকেই অসম্মানিত করে।

দেশের কৃষকদের আজ এ কথা বুঝতে হবে যে, পুঁজিপতিদের অর্থে পুষ্ট তাদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার এই সরকারগুলির কাছ থেকে, ভোটবাজ এই সংসদীয় দলগুলির কাছ থেকে, সংবাদমাধ্যমের প্রচারের কল্যাণে নাম-ডাক ওয়ালা এইসব নেতাদের কাছ থেকে আশা করার কিছু থাকতে পারে না। ন্যায্য প্রাপ্যের সামান্য কিছুও যদি চাষিদের সরকারের থেকে আদায় করতে হয় তবে সঠিক নেতৃত্বে তীব্র কৃষক আন্দোলন তথা গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই।

দক্ষতা থাকলেও চাকরি হচ্ছে না আবার প্রমাণ সমীক্ষায়

চোখ খুলে দেওয়ার মতো একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন দিল্লি আই আই টি-র গবেষক জে জে থমসন। ভারতের বেকারত্ব নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে তিনি দেখেছেন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা দক্ষতাবৃদ্ধি বেকার সমস্যা সমাধানের যথার্থ পথ নয়। স্কিল ডেভেলপমেন্ট চাকরির প্রতিযোগিতায় বাড়তি সুবিধা দেয়, এ কথা সত্য। কিন্তু দক্ষতা থাকলেই নিয়োগ হয় না, হয় নিয়োগকর্তার প্রয়োজন আছে কি না তার ভিত্তিতে। থমসন দেখিয়েছেন, বিভিন্ন আই টি আই (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) থেকে বা অন্যান্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার থেকে যাঁরা পাশ করেছেন তাঁদের ১৪.৫ শতাংশ বেকার। লেদার, প্লাম্বিং, মোটর ড্রাইভিং এবং ট্যুর-ট্রাভেল অপারেশনের মতো মুষ্টিমেয় কিছু ক্ষেত্র বাদ দিলে অন্যান্য সব ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার দুই অঙ্কের। টেক্সটাইলে তা ১৭ শতাংশের কাছাকাছি। মেশিন অপারেশন স্কিলে তা ১৪ শতাংশ। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যারা ডিপ্লোমা করেছেন তাঁদের ২৫ শতাংশের বেশি চাকরি পাননি (সূত্র ঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া -২০.০৭.'১৫)।

কয়েক দশক ধরে ভারতের শাসকশ্রেণি, সরকার এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা বলে যাচ্ছেন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা না থাকাই বেকার সমস্যার মূল কারণ। যেন বৃত্তিমূলক শিক্ষা থাকলেই সবাই চাকরি পেয়ে যাবে। কিন্তু এই বক্তব্য যে সঠিক নয় তা আবারও প্রমাণ করল থমসনের গবেষণা।

তা হলে কী করে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে? থমসনের বক্তব্য, যদি নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করা না যায়, বিশেষত ম্যানুফ্যাকচারিং (উৎপাদন) শিল্প গড়ে না ওঠে, তা হলে শুধু দক্ষতা বৃদ্ধির দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে না। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশনের গত ২০ বছরের তথ্য ঘেঁটে তিনি বলেছেন, ভারতে প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ শিক্ষিত যুবক চাকরির বাজারে এলেও কাজ পায় মাত্র ৫৫ লক্ষ। এর সঙ্গে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের চাপানো শর্তানুযায়ী লক্ষ লক্ষ ছাঁটাই শ্রমিক যুক্ত করলে এবং তার সঙ্গে অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত অনথিভুক্ত বেকারদের ধরলে পরিষ্কার হয়ে যায় ভারতের বেকারত্ব কত ভয়াবহ।

ভারতে কেন্দ্রে বা রাজ্যে যে সমস্ত দল সরকারে ছিল বা আছে তাদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি লক্ষ করলে ফাঁকিটা বেশ স্পষ্ট ধরা পড়ে। এরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে কখনওই বলে না বেকার সমস্যার সমাধান করব। বলে, ক্ষমতায় এলে দু'লাখ, চার লাখ বা পাঁচ লাখ চাকরি দেব। যদিও এ সব প্রতিশ্রুতি তারা পালনের জন্য দেয় না। যুবকদের ঠকিয়ে ভোট আদায়ের জন্য দেয় এবং যথারীতি ভোটের পরেই সে সব ভুলে যায়। এইসব দলগুলির সামনে বেকার সমস্যা সমাধানের বাস্তবানুগ কোনও কর্মসূচিও নেই। বস্তুত বেকার সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত পথ অনুসরণ করতে গেলে এইসব দলগুলি পড়বে অস্তিত্বের সংকটে। ধরা পড়ে যাবে, যে কারণে বেকার সমস্যা, এইসব দলগুলি তাকেই লালনপালন করে।

কেমন করে? থমসনের সূত্র ধরেই এগোনো যাক। থমসন সঠিকভাবে বলেছেন, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প বা উৎপাদন শিল্প ক্রমাগত গড়ে না তুললে বিপুল শ্রমশক্তিকে কাজ দেওয়া যাবে না। কিন্তু উৎপাদন শিল্প গড়ে তোলায় বাধা কোথায়? চোখ-কান খোলা রাখলে যে কেউ বুঝবেন বিশ্বজোড়া মন্দা শিল্পপণ্য বিক্রির বাজার নষ্ট করে দিয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যে সোসিও-ইকনমিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতেও দেখা যাচ্ছে, ভারতে গ্রামের ৯০ শতাংশ পরিবারের সুনির্দিষ্ট বেতনের কোনও কাজ নেই। শহরের অবস্থাও খুব বেশি উন্নত নয়। ১২৫ কোটি মানুষের এই দেশে বেসরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কাজ করে মোট আড়াই কোটি মানুষ। এর সঙ্গে বৃহৎ জমির মালিক এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের বাদ দিলে অর্থনৈতিক সংকটে হিমসিম খাওয়া মানুষের সংখ্যা কমবেশি ১০০ কোটি দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ দেশের ৮০ ভাগ বা তার বেশি মানুষের যদি শিল্প পণ্য কেনার মতো আর্থিক সঙ্গতি না থাকে তা হলে 'শিল্প চাই, শিল্প চাই' বলে মাথা ঠুকে মরলেও কি শিল্প হবে?

শিল্প করতে হলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা চাই। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হলে প্রথমত, চাষিকে ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যে ফড়ে ও ব্যবসায়ীচক্র চাষিকে অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য করে, তা বন্ধ করতে হবে। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণের দাম কমাতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে সরকারি ভরতুকি বাড়াতে হবে। কিন্তু বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার রক্ষক সরকার এসব অনুমোদন করে না। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হলে দ্বিতীয় যে কাজটি করা দরকার তা হল শ্রমিক ছাঁটাই চলবে না, ওয়েজ-ফ্রিজ বা ওয়েজ কাট করা চলবে না, পেনশন-

পাঁচের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রাজ্যে রাজ্যে সভা

হরিয়ানা

৫ আগস্ট এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস পালিত হয় হরিয়ানার রোহতকে। স্থানীয় ছোটুরাম পার্ক হলে স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অনুপ সিংহ। প্রধান বক্তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন, জনজীবনের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই শোষণ-নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তির জন্য চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। উন্নত রুচি-সংস্কৃতির ভিত্তিতে সেই বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার সঠিক পথনির্দেশ রয়েছে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার মধ্যে। নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই শিক্ষাকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও দলের হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতি, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিকৃতিসাধন, শোষিত মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি ইত্যাদির তীব্র নিন্দা করেন। সভার সভাপতি কমরেড অনুপ সিংহ রিলায়েন্সের বাতিল হওয়া প্রকল্পের জন্য অধিগৃহীত ১০ হাজার একর জমি কৃষকদের ফেরত দেওয়ার দাবি জানান।

ছত্তিশগড়

৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে ছত্তিশগড়ের দুরগ শহরে সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার পর রাজ্য নেতা কমরেডস আত্মারাম সাহু, মহেন্দ্র সাহু এবং নিবাস অধিকারী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু তাঁর ভাষণে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আই (সি)-কে গড়ে তোলার যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম কমরেড শিবদাস ঘোষ করেছিলেন তা বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন। এদেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষাকে বিশেষীকৃত করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ কীভাবে এই দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছেন তা তিনি দেখান। আজকের দিনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ব্যক্তিসম্পত্তির মালিকানাজনিত মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামের যে রাস্তা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, তা উল্লেখ করে কমরেড গোপাল কুণ্ডু বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মীদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে দেখান। বামপন্থী শক্তিগুলির যুক্ত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি তুলে ধরেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড বিশ্বজিত হারোড়ে।

মহারাষ্ট্র

মুম্বইয়ের জনতা কেন্দ্রে ৮ আগস্ট সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন গুজরাট রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড তপন দাশগুপ্ত। সভাপতি ছিলেন দলের মুম্বই ইউনিট ইনচার্জ কমরেড অনিল ত্যাগী।

ওড়িশা

কটকের শহিদ ভবনে ৭ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন দলের ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক কমরেড রবীন সমাজপতি। সভাপতিত্ব করেন ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাস।

মধ্যপ্রদেশ

রাজধানী ভোপালের সুভাষনগরে ৬ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড উমা প্রসাদ। প্রধান বক্তা ছিলেন ওড়িশা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। এছাড়া বক্তব্য রাখেন মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল।

শুরুতে ৪ আগস্ট হরদায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে দু'মিনিট নীরবতা পালিত হয়। এর পর বক্তব্য রাখেন কমরেড প্রতাপ সামল। মধ্যপ্রদেশ সহ গোটা দেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত এক বছরে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার বড় বড় বুলি আওড়াতে আওড়াতে জনজীবনের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত বলেন, এই দেশ এবং গোটা দুনিয়া জুড়েই বাজারসংকটে জর্জরিত পুঁজিপতি শ্রেণি আরও নগ্নভাবে শোষণ-লুণ্ঠন চালাচ্ছে, যার প্রতিবাদে দিকে দিকে খেটে খাওয়া মানুষ ফেটে পড়ছে তীব্র বিক্ষোভে। এর বিরুদ্ধে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সঠিক রাস্তায় আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতেই আজকের দিনে যথার্থ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠা সম্ভব। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনা করার পাশাপাশি চিন্তা ও সংস্কৃতিতে ব্যক্তিবাদী মানসিকতা উচ্ছেদের লড়াই জোরদার করার কথা তিনি উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণের পর আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

গুজরাট

৮ আগস্ট আমেদাবাদে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা। গুজরাট সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড দ্বারিকানাথ রথও বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন কমরেড মীনাক্ষি যোশি। সভার আগে কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতির প্রতিবাদে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড শঙ্কর সাহা

উত্তরপ্রদেশ

৯ আগস্ট লক্ষ্ণৌতে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর

ত্রাণের দাবিতে জয়নগরে বিক্ষোভ

সাম্প্রতিক অতিবর্ষণে জয়নগর-২ নম্বর ব্লকে বেশিরভাগ জমি জলে ডুবে যাওয়ার ফলে বীজতলা বা রোওয়া ধান নষ্ট হয়ে গেছে। নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে জমা জল দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ারও আশা নেই। চাষেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পুকুর-জলাশয় প্লাবিত হওয়ায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত মাছ চাষ। এর ফলে চাষিরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। এই ব্লকে প্রায় ২ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত আরও বহু। নলকূপগুলিও অনেক জায়গায় জলে ডুবে যাওয়ায় জলবাহিত রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে।

দুর্গত মানুষের জন্য ত্রাণের দাবিতে ২৭ জুলাই এস ইউ সি আই (সি)-র জয়নগর-২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে শত শত দুর্গত মানুষ স্থানীয় বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। চাষের ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি সারানোর অনুদান, সরকারি রিলিফ, পানীয় জল পরিশোধন, মাছ চাষিদের ক্ষতিপূরণ এবং সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে মেডিকেল টিম পাঠানোর দাবিতে বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থার জন্য মাস্টার প্ল্যানেরও দাবি জানানো হয়। প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার, কমরেড বসুদেব পুরকাইত, কমরেড স্বপন প্রামাণিক। জমায়েতে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রূপম চৌধুরি, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সিরাজ মোল্লা প্রমুখ।

মেদিনীপুরে অঞ্চল প্রধান ঘেরাও, দাবি আদায়

বিভিন্ন গ্রামের ২০টি বেহাল রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার, সপ্তাহের সকল কাজের দিনে সার্টিফিকেট প্রদান, পঞ্চায়েত কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল, এলাকার সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করা, সোয়াদীঘি খালের উপর নড়বড়ে কাঠের পুলকে কংক্রিট করা ও সকল গরিব মানুষের নাম জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের প্রাপক তালিকায় রাখা সহ ১২ দফা দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বল্লুক-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে ২৩ জুলাই ঘেরাও করা হয়। দলের নোনাকুড়ি আঞ্চলিক কমিটির আহ্বানে এলাকার তিন শতাধিক মানুষ এতে অংশ নেয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস স্বপন সামন্ত, সোমনাথ ভৌমিক, সুদীপ বাগ, জয়দেব সাঁতরা, মোহন মাইতি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এলাকার মানুষজনের প্রবল বিক্ষোভের চাপে অঞ্চল প্রধান কিছু দাবি তৎক্ষণাৎ মেনে নেন এবং অন্যান্য বিষয়গুলি পঞ্চায়েতের সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান।

নন্দীগ্রামে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির

২৪ জুলাই নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ার শহিদ হাসপাতালে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়। ডাঃ ভবানীশঙ্কর দাস ও ডঃ শামস মুসাফিরের নেতৃত্বে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিকেল ছাত্ররা এ দিন দুই শতাধিক রোগীর চিকিৎসা করেন। রোগীদের বিনা মূল্যে ওষুধপত্র বিতরণ করা হয়।

মুন্সি প্রেমচাঁদ জন্মজয়ন্তী পালিত

মুন্সি প্রেমচাঁদের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গুজরাটের সুরাটে এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে ২ আগস্ট খোড়িয়ার নগর ইআরএম বিদ্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সুরাট জেলা সম্পাদক কমরেড প্রয়াগরাজ মৌর্য, কমরেডস নওল কুমার ঝা, বাকেলাল মৌর্য, রামমুরত মৌর্য প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। মুখ্য আলোচক ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড তুমুল কটারা। রাজকুমারী মৌর্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পরিচারিকা সমিতির বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন

৮ জুলাই সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আগে পরিচারিকা মা-বোনেরা মিছিল করে জেলাশাসকের কাছে ১০ দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেন। তিনি কয়েকটি দাবি মেনে নেন। এরপর সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। প্রতিনিধিরা তাঁদের জীবনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী লিলি পাল সমস্যা সমাধানের দাবিতে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সম্মেলনে লক্ষ্মী সরকারকে সভানেত্রী, গীতা চৌধুরীকে সহ সভানেত্রী, ভারতী দাসকে সম্পাদিকা ও মনা সিংহকে সহ সম্পাদিকা করে ১৯ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

রাজস্থানের জয়পুরে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সভা

৮ আগস্ট জয়পুরে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড আর ডি চৌধুরী।

আশা কর্মীদের আন্দোলন

সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা বেতন এবং বোনাস, পিএফ, পেনশন ইত্যাদি সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে আশা কর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্লক স্তর থেকে শুরু করে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশনে সামিল হচ্ছেন তাঁরা। চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। ৮ সেপ্টেম্বর আশা কর্মীদের একমাত্র রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত 'পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন'-এর ডাকে কলকাতায় বিক্ষোভ সমাবেশের মধ্য দিয়ে রাজ্যপালের মাধ্যমে এই স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠানো হবে।

২৪ জুলাই ডায়মন্ডহারবার মহকুমা আশা কর্মী সম্মেলনে ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি বিমল জানা আশা কর্মীদের আন্দোলনের নানা দিক তুলে ধরেন। জেলা সভানেত্রী মাধবী পণ্ডিতও বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে ২ সেপ্টেম্বর সারা ভারত ধর্মঘটে আশা কর্মীদের সামিল হওয়ার আহ্বান জানান এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য কমিটির সদস্য ইসমত আরা খাতুন। এ আই ইউ টি ইউ সির জেলা কমিটির সদস্য মনিরুল ইসলাম, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের মহকুমা সম্পাদিকা সুদীপ্তা ত্রিপাঠি আচার্য প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন গৌতম মণ্ডল, সঞ্চালনা করেন তাপসী মণ্ডল। সম্মেলন থেকে ২৪ জনের কোর কমিটি গঠিত হয়।

২৮ জুলাই পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে জঙ্গলমহলের শতাধিক আশা কর্মী সিএমওএইচ-এর কাছে বিক্ষোভ দেখান। পূর্ণ বেরা, অর্চনা বেরার নেতৃত্বে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

একই দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর-১ এবং বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকে কয়েক শত আশা কর্মীর বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে সুবীর দাস ও প্রভাতী গোস্বামী।

৩১ জুলাই বীরভূমের সিউড়িতে তিন শতাধিক আশা কর্মীর বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন কুদ্দুস আলি, আয়েশা খাতুন এবং ইসমত আরা খাতুন।

দক্ষতা থাকলেও চাকরি হচ্ছে না

তিনের পাতার পর

পিএফ-গ্র্যাচুইটি-ইএসআই ইত্যাদি থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা চলবে না, মূল্যবৃদ্ধির সাপেক্ষে বেতন বাড়াতে হবে। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সরকার এর বিপরীত দিকেই হাঁটছে। সর্বোচ্চ মুনাফা করতে গিয়ে বুর্জোয়ারা যে সর্বোচ্চ শোষণ জারি করেছে, তার ফলে ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে যা শিল্পায়নের সামনে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং শিল্পায়নের রুদ্ধ দরজা যদি খুলে দিতে হয় তা হলে এই মুনাফা লোটার পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই সরাতে হবে। যা কোনও দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দল করতে পারে না। মার্কসবাদ সঠিকভাবেই দেখিয়েছে বেকার সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ না করে। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদ আপন নিয়মে উচ্ছেদ হবে না। তাকে উচ্ছেদ করার জন্য প্রয়োজন একটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি।

ভারতে কোন দল পুঁজিবাদ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে? দক্ষিণপন্থী দলগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষকের ভূমিকা পালন করছে। বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদ কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, "ভারতবর্ষে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচয় দেয় এমন সমস্ত দলের মধ্যে আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া খোলাখুলি ভাষায় পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের কথা সিপিআই (এম)-ও বলছে না, সিপিআই-ও বলছে না। তারা বলছে, ভারতবর্ষের শোষিত মানুষ অর্থাৎ মজুর-কিষাণ-নিম্ন মধ্যবিত্তের মূল লড়াই হচ্ছে একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। ... যেখানে শোষণ হচ্ছে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্য, সেখানে যারা গোটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদের কথা না বলে সমস্ত পুঁজিপতিশ্রেণির শোষণের দায়দায়িত্বটা গুটিকয়েক একচেটে পুঁজিপতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে, তারা আসলে পুঁজিবাদী শোষণের চরিত্র আড়াল করতে চাইছে" ('চাষি আন্দোলন প্রসঙ্গে', শিবদাস ঘোষ রচনাবলি, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৬)।

যারা যথার্থই বেকার সমস্যার সমাধান চান তাঁদের আজ পুঁজিবাদবিরোধী অবস্থান নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সেই কারণে পুঁজিবাদবিরোধী যথার্থ শক্তি কোনটি তার অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরি। সমধিক জরুরি এই দলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়ে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লড়াইকে শক্তিশালী করা।

ভোটের ঘণ্টা বাজতেই ভোটব্যাঙ্ক তৈরির খেলা শুরু

কংগ্রেস এ রাজ্যে হঠাৎ সংখ্যালঘুদের দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছে। বিবৃতি দিয়ে, সভা ঘোষণা করে সংবাদের শিরোনামে এসেছে। কেন্দ্রে বিজেপির দুর্নীতি নিয়ে হইচই বাধালেও রাজ্যে সংখ্যালঘুর অনুন্নয়ন তাদের দাবার চাল। ভোট রাজনীতির এই সব কারবারিরা ভোটের নিরিখে তলানিতে এসে ঠেকেছে। বিধানসভা ভোটের ঘন্টা বাজতেই তাই ভোট ব্যাঙ্কের খোঁজ চলছে। একটা, দুটো নয়, একেবারে রাজ্যের ২৭ শতাংশের দিকেই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু শুধু কংগ্রেসকে দোষ দিলে সত্যের অপলাপ হবে। তারা কেন্দ্রে অর্ধশতাব্দী রাজত্ব করে ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাত, সব ধরনের সংখ্যালঘুদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলেছে। বাকিরাও তাদের পথ অনুসরণ করেছে। বাদ যায়নি কেউ। নির্বাচনী গণতন্ত্রে প্রতিশ্রুতিই বড় কথা। ভোটের সামনে দাঁড়িয়ে সকলে তা দুই হাতে বিতরণ করেছে। এ ব্যাপারে কোনও ভুলচুক কারওর নেই। পরে কী হবে 'দেবা ন জানন্তি'।

'সাচার কমিটি'র রিপোর্টকে হাতিয়ার করে সংখ্যালঘুদের দুর্দশা নিয়ে ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেত্রী কলরব তুলেছিলেন। তাতে বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন তৎকালীন ফ্রন্ট নেতৃত্ব। তাঁরাই এতদিন এ রাজ্যের সংখ্যালঘু দরদের চ্যাম্পিয়ান ছিলেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এতদিন ভাবত দেশের দক্ষিণপন্থী 'রাম' রাজনীতি থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে একমাত্র 'বাম'পন্থীরা। বামপন্থী বলতে তারা শাসক সিপিএম-কেই বুঝত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের প্রোটেকশানের কথা ভেবে শাসকদলের সঙ্গে থেকেছে। শাসকরাও দেখাতে চেয়েছে তারাই এদের ত্রাতা। কিন্তু সাচার কমিটির রিপোর্টে দেখা গেল, এ রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে তিমিরে ছিল সেখানেই থেকে গেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সব কিছুর নিরিখে গোটা মুসলিম সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চূড়ান্ত দুর্দশাগ্রস্ত। ফলে হই হই শুরু হয়ে যায় ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে। তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই তাস লুফে নেন। শুরু হয়ে যায় তাদের ভোট রাজনীতির খেলা। সিপিএম নেতৃত্বও মুসলিমদের মধ্যে ওবিসি খুঁজে বার করেন। ২০১০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি এদের জন্য সংরক্ষণ করেন। কিন্তু তা দিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোল হয়নি। শেষ পর্যন্ত রাজ্যে পট পরিবর্তন হল। নয়া কর্ণধারও নতুন কোনও দিশা দেখাতে পারেননি। তিনিও পঞ্চায়েত, পুরসভা, লোকসভা নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়ে সেই সস্তা চমকের খেলা শুরু করলেন। ইমামদের জন্য মাসে আড়াই হাজার টাকার বৃত্তি, মুসলিমদের জন্য পৃথক ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা, ৫০০ কোটি টাকা মসজিদ উন্নয়ন ফান্ড, মাদ্রাসার উন্নয়ন এবং বৃদ্ধি ইত্যাদির পথে রাজ্যের সংখ্যালঘুর মন জয়ে লেগে গেলেন। বিপরীতে কলকাতার রাজপথে পুরোহিতদের অভিনব মিছিলও আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। এস ইউ সি আই (সি) দলের ধারাবাহিক আন্দোলন এবং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে ভিত্তি করে রাজ্যে যতটুকু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তা নস্যাৎ করে ধর্মীয় জাতপাতভিত্তিক ভোটব্যাঙ্ক তৈরির রাজনীতি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিম নয়, হিন্দি বলয়ের মতোই এখানেও তফসিলি ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে 'বড়মাকেন্দ্রিক মতুয়া সম্প্রদায়ের' রাজনীতির জন্ম দেওয়া হল।

বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে আবার সেই একই খেলা শুরু হয়ে গেছে। রাজ্যের বহু মাদ্রাসা আছে, যেগুলি সরকারি সাহায্য এখনও পায় না। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলি অনুমোদন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। তৃণমূল সরকার সংখ্যালঘু দরদের কথা বলে ৮৯ শতাংশ তহবিল অনুমোদন করেছে। কিন্তু তাদের বিধায়ক কমিটি জানিয়েছে এই খাতে খরচের হার শূন্য শতাংশ। যে মাদ্রাসাগুলিতে সরকারি অর্থ অনুমোদিত হয়নি, সেখানেও মিড ডে মিল, পরিকাঠামো উন্নয়নে ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য ইত্যাদির ঢালাও প্রতিশ্রুতি বিতরণ করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। এই অভিযোগে এখন কংগ্রেস না কি আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। আরও অনেক ভোট শিকারিরাও হয়তো একই পথে হাঁটবে। তারাও এদের নানা প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভাসিয়ে দেবে।

সংখ্যালঘুদের অনগ্রসরতার সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরির চেষ্টা দেশে নতুন নয়। দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বয়স যতদিন শাসক রাজনৈতিক দলগুলির ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাতভিত্তিক রাজনীতির চর্চাও ততদিন। যে কংগ্রেস এখন মুসলিম দরদের কথা বলছে, তারাই কিন্তু বাবরি মসজিদের দরজা খুলে রামলালা মূর্তির পুজো শুরু করিয়েছিল। এই বিতর্কে ইন্ধন জুগিয়েছিল তারাই। শাহবানু মামলায় মুসলিম মৌলবাদীদের পক্ষে রায়ের পিছনেও সেই কংগ্রেস। কংগ্রেস পরিচালিত এনসিপি সমর্থিত মহারাষ্ট্র সরকার সেই একই রাজনীতির হাত ধরে মারাঠা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। হিন্দু ভোটকে পাখির চোখ করে হিন্দুত্বের রাজনীতির কারবারি বিজেপির পাল্টা সাম্প্রদায়িক চেহারায় গোটা দেশ আতঙ্কিত। প্রতিটি নির্বাচনের আগে দাঙ্গার খেলা খেলছে এরা। আবার ভারতের মতো বিশাল দেশে মুসলিম ভোটের কথাও এদের ভাবতে হয়। তাই কিছু মুসলিম মুখের প্রয়োজন এদেরও হয়। বাজপেয়ীজি যখন ডাঃ আবদুল কালামকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করেন তখন এই প্রশ্ন উঠেছিল। আবার সম্প্রতি ডঃ কালামের মৃত্যুতেও বিজেপি কি সেই রাজনীতিরই খেলা খেলছে না? সম্প্রদায়, জাত-পাতে সুড়সুড়ি দিয়ে ভারতবর্ষের মহান (!) গণতন্ত্রের নির্বাচনী বৈতরণী পার হচ্ছে সংসদীয় রাজনীতির ভোট শিকারিরা। প্রকৃত মার্কসবাদী দল না হওয়ার ফলে এ দেশের সংসদীয় ক্ষেত্রের বড় বামপন্থী দলগুলিও ভোটের প্রয়োজনে এই কাজ করেছে। কেরলে সিপিএম নেতা নাম্বুদ্রিপাদের আমলে সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য নতুন একটি জেলা মাল্লাপুরমের জন্ম দেওয়া হয়। কেরল রাজনীতিতে মুসলিম লীগকে ভোটের প্রয়োজনে দরকার। তাই তাদের নেতা পি কে কুঞ্ঞলিকুট্টি দুর্নীতি করলেও তা মাপ হয়ে যায়। এ রাজ্যেও ২০০১ সালে মুসলিমদের জন্য সরকারি চাকরি এবং সরকারি কলেজে ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের দাবি তোলে ফ্রন্ট সরকার।

কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসে জনতা দল নেতা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং অনগ্রসর শ্রেণির ভোট পেতে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেন। জাত-পাতের রাজনীতি উস্কে ওঠে। পাশাপাশি হিন্দু ভোটও এককাট্টা হবার সুযোগ পায়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনীতিতে জাঠ ভোট বিরাট ফ্যাক্টর। সেই ভোট পেতে জাঠদের জন্য সংরক্ষণের দাবি তোলে রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে কংগ্রেস। ওবিসি হিসাবে জাঠদের ৯টি রাজ্যে সংরক্ষণের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়। যদিও পরে তা কোর্টের নির্দেশে বাতিল হয়ে যায়। গোটা হিন্দি বলয়ে জাতই রাজনীতির মুখ্য বিন্দু হয়ে গেছে। বিএসপি, জনতা দলের নানা শাখা তো সরাসরি দলিত ভোট, যাদব ভোট ইত্যাদির সেন্টিমেন্ট তুলে এদের ভালো করার ঠিকাদারি নিয়ে রেখেছে। দক্ষিণ ভারতের ভোটকেন্দ্রিক দলগুলোর রাজনীতির মুখ্য বিষয়ও এই সব নানা ধরনের জাত-পাতের সেন্টিমেন্ট।

সারা দেশে এই আবহাওয়ায় ধর্ম-বর্ণ-জাত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কোথায় কতটুকু স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে? এদের ঠিকেদার হয়ে ক্ষমতায় যারা যাচ্ছে তারা শেষপর্যন্ত কাদের স্বার্থ রক্ষা করছে? নানা ধরনের সংরক্ষিত শ্রেণির পাহারাদাররা এদের শিক্ষা দীক্ষা আর্থিক সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। ৯৯ শতাংশ মানুষ তিমিরেই পড়ে আছে। বাস্তবে বাকি ১ শতাংশের উন্নতিই এই সব দলের লক্ষ্য।

এই জাতপাত-ধর্ম-বর্ণের রাজনীতি দিয়ে অনুন্নয়নের মূল কারণটাকে আড়াল করা হচ্ছে। সমাজের কোনও একটি বিশেষ অংশের অনুন্নয়নের জন্য যে আর একটি বিশেষ অংশ দায়ী নয়, দায়ী আসলে এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের রাজনীতিকরা সেটাকেই আড়াল করেন। তাই পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যম সেগুলির ফলাও প্রচার করে। এই রাজনীতিকরা ভোটের স্বার্থে এক অংশের মানুষকে আর এক অংশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, অনেক সময়েই ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে জড়িয়ে দেয়। পুঁজিবাদ থাকে নিশ্চিন্তে। আজ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শোষিত মানুষকে এ কথা নিঃসংশয়ে বুঝতে হবে যে, শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রেখে যেমন তাদের জীবনে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়, তেমনই জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের রাজনীতি নিয়ে চলতে থাকলে শোষিত মানুষের প্রকৃত শত্রু পুঁজিবাদকে চেনাও সম্ভব নয়।

ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের দাবি পূর্ব মেদিনীপুরে

জলবন্দি এলাকার দ্রুত জল নিষ্কাশন, পর্যাপ্ত ত্রাণ ও ফসলের ক্ষতিপূরণ সহ সাত দফা দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন-খরা প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে ৬ আগস্ট জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলাশাসক সঙ্গে সঙ্গে সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে দ্রুত জলনিকাশি ও বাঁধ মেরামতের নির্দেশ দেন। উপরোক্ত দাবিতে ৩ আগস্ট জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর উদ্দেশেও স্মারকলিপি পাঠানো হয়। ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, মধুসূদন বেরা, নারায়ণ প্রামাণিক, চন্দ্রমোহন মানিক, কৃষ্ণপ্রসাদ জানা প্রমুখ।

সর্বদলীয় সভা

একের পাতার পর

গেছে। শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরা নিজে হাতে শয়ে শয়ে ত্রিপল বিলি করছেন এবং তা সরকারি দপ্তর থেকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, অথচ বিরোধী দলের বিধায়ক চাইলে নামমাত্র দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ৩০০ জন শরণার্থী আছে। চাল-ডাল-ত্রিপল-জামাকাপড়ও চলে যাচ্ছে। বাস্তবে সেই স্কুলে কোনও ত্রাণ শিবির নেই। মুর্শিদাবাদ জেলার ১১টি ব্লকের ৫ লক্ষ মানুষ বন্যা কবলিত। হরিনগর, পায়রাখোল, নতুনগ্রামের নামুপাড়া, আইরি নগর, সাবিত্রীনগর, রানিপুর ইত্যাদি জায়গায় এখনও ত্রাণের দেখা নেই। এরকম বহু উদাহরণ অন্যান্য জেলা থেকে দেওয়া যেতে পারে। এই যখন অবস্থা তখন ত্রাণ লুঠ করার লোভে নদীর বাঁধ কেটে পরিকল্পিত বন্যা তৈরি করা হয়েছে — যা ঘটেছে ব্রাহ্মণী নদীর বাঁধ কেটে রামপুরহাট ২ ব্লকে। দুই তৃণমূল নেতা এতে অভিযুক্ত।

অন্যদিকে ত্রাণ চাইতে গিয়ে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে ক্যানিংয়ের জীবনতলায় ত্রাণশিবিরে এক আর্ত মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন, বাসন্তীর আঠারোবাঁকিতে দুর্গতরা ত্রাণ চাইলে পঞ্চায়েত প্রধান দলবল নিয়ে হামলা করেছে, এমনকী রেডক্রসের কর্মীরাও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

আমরা খুব উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি, বন্যা কবলিত এলাকা থেকে জল নেমে যাওয়ার পর এখন আন্ত্রিক শুরু হচ্ছে, মানুষকে সাপে কাটছে, মানুষ মারা যাচ্ছে। হাসপাতাল সহ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এমনিতেই ডাক্তার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা খুবই কম। সেখানে এত বিস্তীর্ণ প্লাবিত এলাকায় চিকিৎসার ব্যবস্থা কী হচ্ছে তা আমরা জানি না।

এই রাজ্যে বাস্তবে কোনওদিনই বন্যা প্রতিরোধে সামগ্রিক ও সুসংহত কোনও ব্যবস্থা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত ড্যাম, নদী এবং জলাধারগুলির যেমন সংস্কার হয়নি, তেমনই রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত নদীর পাড় ও খালগুলি নিয়মিত সংস্কার হয়নি। সংস্কারের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ হয়নি। যতটুকু বরাদ্দ হয়েছে, দুর্নীতির কারণে নদীবাঁধগুলি ও খালগুলি যথাযথভাবে সংস্কার হয়নি।

এমন একটা বিপর্যয়ের সময়েও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও দায়িত্বই নিচ্ছে না, এমনকী কোনও উচ্চবাচ্যও করছে না। আমরা তার তীব্র নিন্দা করি। অন্যদিকে রাজ্য সরকারও রাজ্যকে বন্যা কবলিত বলে এখনও ঘোষণা করেনি। এই বন্যা দেখিয়ে দিল যে, ক্ষমতায় আসার চার বছর পরেও বর্তমান সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাস্তবে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি।

এই পরিস্থিতিতে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলি উত্থাপন করছি ও দ্রুত তা কার্যকর করার আবেদন করছি।

১। ত্রাণে দুর্নীতি ও দলবাজি বন্ধ করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। মৃতের পরিবার সহ ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৩। ত্রাণ বণ্টনে রাজ্যস্তর থেকে সর্বনিম্নস্তর পর্যন্ত সর্বদলীয় কমিটি করে তার মাধ্যমে ত্রাণ, উদ্ধার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪।পরবর্তী চাষের জন্য ঋণ, সস্তায় বীজ-সার-কীটনাশক দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যে জমি চাষের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে, তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৫। ত্রাণ বণ্টনে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে বাধা দেওয়া চলবে না। প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে ৬। বন্যা নিয়ন্ত্রণে আশু ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। ৭। বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ব্রিজ, প্রভৃতির দ্রুত মেরামত, সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ৮।বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য বিধানসভার সর্বদলীয় টিম পাঠাতে হবে।

ধন্যবাদান্তে

তরুণকান্তি নস্কর

বিধায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

জাপান আবার চলেছে যুদ্ধে

জাপানে আজ আবার যুদ্ধের সাজো সাজো রব। প্রধানমন্ত্রী সিনজো অ্যাবে সংবিধান বদলে ফেলতে বিল এনেছেন পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে। পার্লামেন্টে যখন শাসক দলের সাংসদদের ভোটে বিল পাশ হচ্ছে, বাইরে তখন লাখো জাপানবাসী প্রবল বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। দাবি করছে, আইন বদলে জাপানকে মার্কিন যুদ্ধ পরিকল্পনার শরিকে পরিণত করা চলবে না, জাপানি যুবকদের পুনরায় যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া চলবে না।

এত দিন শুধুমাত্র 'আত্মরক্ষা'ই ছিল জাপানের প্রতিরক্ষা নীতি। এখন তা 'যৌথ আত্মরক্ষা' নাম দিয়ে বদলে ফেলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আইন বদলে জাপান সেনাবাহিনী গঠন করেছে। নতুন আইনে সেই সেনাবাহিনী অন্য যে কোনও দেশে গিয়ে 'মিত্রশক্তির রক্ষায়' যুদ্ধে অংশ নিতে পারবে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটের শরিক হবে।

জাপানের সাধারণ মানুষ সরকারের এই সামরিক পরিকল্পনার তীব্র বিরোধী। কারণ তারা আজও ভুলতে পারেনি সেই সাংঘাতিক দিন দুটোকে। কেউ কি ভুলতে পেরেছে ৬ এবং ৯ আগস্টকে? না, ভুলতে পারেনি বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ। ৬ আগস্ট দিনটি আজও দেশে দেশে যুদ্ধবিরোধী দিবস হিসাবে পালিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েত লাল ফৌজের কাছে ফ্যাসিস্ট জার্মানি ১৯৪৫ সালের ৮ মে আত্মসমর্পণ করে। অপর ফ্যাসিস্ট শক্তি জাপান যাতে সোভিয়েত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে মার্কিন বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, তাই মিত্র শক্তির কাউকে না জানিয়ে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোসিমা এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকি শহরে বিধ্বংসী আণবিক বোমা ফেলে আমেরিকা। অথচ জাপানের উপর এমন বাড়তি চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না। জার্মানির পরাজয়ের পর জাপান তখন আত্মসমর্পণের মুখে। যে কোনও দিন সে আত্মসমর্পণ করবে। তা হলে? আসলে আমেরিকার ভয় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে। তার কর্ণধার মহান স্ট্যালিনকে। জার্মানির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বিশ্ব জুড়ে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শক্তির বিজয় ঘোষিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের আগ্রহ-আবেগ তুঙ্গে উঠেছে। সভ্যতার ত্রাতা হিসাবে স্ট্যালিনের নাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অবস্থায় জাপানও যদি সোভিয়েতের কাছে আত্মসমর্পণ করে তবে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রভাব এশিয়ার বিরাট অংশেও ছড়িয়ে পড়বে। এখানেই ভয় আমেরিকার। তাই তড়িঘড়ি, অত্যন্ত সংগোপনে আণবিক বোমা ফেলার সিদ্ধান্ত। মরলই বা লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ। পুঁজিবাদের কাছে সাধারণ মানুষ মুনাফা উৎপাদনের কাঁচামাল বৈ তো নয়। বোমার আঘাতে হিরোসিমা শহরের পাঁচ বর্গমাইল পরিমাণ অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মারা গিয়েছিল এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার মানুষ। নাগাসাকিতে মারা গিয়েছিল প্রায় আশি হাজার মানুষ। শুধু হিরোসিমা-নাগাসাকিই নয়, টোকিও শহরে মার্কিন কার্পেট বোম্বিংয়ে এক রাতে ৭২ হাজার মানুষ মারা যায়। জাপানের অন্যান্য দ্বীপগুলিতেও মার্কিন হানাদারিতে মৃত্যু হয়েছিল হাজার হাজার মানুষের।

এমন ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সাক্ষী যে দেশ, সেই জাপান এতদিন পর হঠাৎ আবার সামরিক সাজে মেতে উঠছে কেন?

সাম্রাজ্যবাদ-শিরোমণি আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা এর অন্যতম কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান কেবল পরাজিতই হয়নি, বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় মিত্রপক্ষের নির্দেশে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ করার শর্ত না মেনে জাপানের উপায় ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত জার্মানি ও জাপানে মার্কিন আধিপত্য দেখে অনেকে ভেবেছিলেন এই দুই রাষ্ট্র আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এদের ভুল ভাঙাতে মহান স্ট্যালিন সেদিন বলেছিলেন, মার্কিন বুটের তলায় জার্মানি ও জাপান দীর্ঘদিন পদানত থাকবে না, এই দুই দেশের বুর্জোয়ারা আবার মাথা তুলবেই। মহান স্ট্যালিনের কথাই সত্য প্রমাণ হয়েছে। 'নিরস্ত্রীকরণ' শর্তের সুযোগ নিয়ে সামরিক খাতে ব্যয় না করে জাপানের বুর্জোয়া শ্রেণি মার্কিন সাহায্যে একটি আর্থিক শক্তি হিসাবে জাপানকে দাঁড় করাতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঐ শর্তের অনুষঙ্গ হিসাবে জাপানের সামরিক নিরাপত্তার দায় মার্কিন শাসকরা নিয়ে নেয়। প্রশান্ত মহাসাগর ছাড়াও জাপানের নানা স্থানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি তৈরি হয়, যার বিরুদ্ধে জাপানের জনগণের বিক্ষোভের সংবাদও বহু সময় প্রকাশ পেয়েছে।

আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমায় মৃতদেহের সারি

কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে জাপানে কেবল সামরিক ঘাঁটি রেখেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আশ্বস্ত বোধ করছে না। মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলের মতো করেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানকে হয়ত আমেরিকা দেখতে চায়। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে সিনজো অ্যাবের উপস্থিতিতে মার্কিন-জাপান নতুন 'নিরাপত্তা নীতি' ঘোষিত হয়েছে। সেখানে জাপানকে দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে 'অধিকতর দায়িত্ব' নেওয়ার কথা বলেছে আমেরিকা। প্রধানমন্ত্রী অ্যাবে সেখানেই মার্কিনি শাসকদের এই নতুন বিল পাশ করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন। এশীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধিকে জুজু হিসাবে দেখিয়ে জাপানকে এই কাজে রাজি করাতে আমেরিকাকে বোধহয় খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। চীনের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামরিক প্রভাব বৃদ্ধির পাল্টা জাপানকে একটা সামরিক শক্তি হিসাবে ঘনিষ্ঠ করে নেওয়ার বাস্তব তাগিদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে দেখা দিয়েছে। এর ফলে সামরিক শিল্পে অগ্রগামী ও সামরিক শিল্প-নির্ভর অর্থনীতির দেশ আমেরিকার অর্থনীতির সংকটের সুরাহা করতে জাপানের বাজার কিছুটা সহায়তা দেবে।

জাপানের যুদ্ধসাজের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, বিশ্বমন্দার ধাক্কায় জাপ অর্থনীতিও টলোমলো। অর্থনীতিতে হাজার হাজার কোটি ডলার স্টিমুলাস হিসাবে ঢেলে, শত শত কোটি নোট ছেপেও অ্যাবে সরকার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারেনি। বরং অর্থনীতির গতি আরও নিম্নমুখী হয়েছে, হু হু করে জাপানি মুদ্রা ইয়েনের দাম পড়ে গেছে, মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া হয়েছে। মানুষের বিক্ষোভ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের দেশে দেশে সংকট-জর্জরিত পুঁজিপতি শ্রেণি যেমন শেষ আশ্রয় হিসাবে অর্থনীতির সামরিকীকরণকেই মুশকিল আসান হিসাবে আঁকড়ে ধরছে, জাপানের পুঁজিপতি শ্রেণিও তেমনই এই আইন পরিবর্তনের দ্বারা আসলে অর্থনীতির সামরিকীকরণের দিকেই এগিয়ে গেল। জাপানের প্রযুক্তিগত উন্নত অবস্থান স্বাভাবিক ভাবেই যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে তাকে অনেক পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশের থেকেই এগিয়ে দেবে। জাপানের পুঁজিপতি শ্রেণিও এই পরিবর্তনের জন্য সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে যাচ্ছিল। জাপানের যে-সব কোম্পানি এতদিন মোটর সাইকেল, ওয়াশিং মেশিন, ল্যাপটপ বা নানা ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য উৎপাদনের জন্য খ্যাত ছিল, সেই মিতসুবিশি, কাওয়াসাকি, হিতাচি, তোশিবা প্রভৃতি নানা সংস্থা এখন যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে মন দিয়েছে। যুদ্ধাস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রে ৫০ বছর ধরে যে নিষেধাজ্ঞা দেশে চলে আসছিল গত বছর অ্যাবে-সরকার তা তুলে নিয়েছে। ফলে মহা সমারোহে জাপানি পুঁজিপতিরা অস্ত্র নির্মাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ যেমন আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এক শক্তিধর দেশ হিসাবে জাপানকে প্রতিষ্ঠা দেবে, তেমনই একদিকে জাপান সরকারকে অপরদিকে বিদেশের বাজারে অস্ত্র বেচে জাপানি পুঁজিপতিরাও তাদের বাজার-সংকট কিছুটা হলেও কাটানোর চেষ্টা করবে। অন্যতম ক্রেতা হিসাবে তারা মনে করছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের দেশগুলিকেই। ভোগ্যপণ্য নয়, অস্ত্র উৎপাদনই এখন বড় ব্যবসা।

স্বাভাবিকভাবেই জাপানের এই ভূমিকায় চীন, দুই কোরিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশগুলি, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি সেনাবাহিনীর ভয়ঙ্কর নৃশংসতার শিকার হয়েছিল, তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া, যার সাথে যুদ্ধবাজ আমেরিকার খুবই দহরম-মহরম, তারাও জাপানের যুদ্ধসাজকে আতঙ্কের চোখে দেখছে। তারা বলেছে, জাপানের উচিত প্রচলিত সংবিধানকেই সম্মান জানানো। উত্তর কোরিয়া বলেছে, পুনরায় যুদ্ধের নেশায় মেতে উঠলে জাপানের সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইতিপূর্বে চীন বা কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রশ্নে সেই ভয়াবহ স্মৃতি বারেবারে উঠে এসেছে। চীন এবং কোরিয়া উভয় দেশই বলেছে, এই সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে হলে জাপানকে পুরনো কার্যকলাপের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। কিন্তু জাপান ক্ষমা চাইতে রাজি হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী জাপানের এই চরিত্র যেমন চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলি ভুলতে পারেনি, তেমনই জাপানের সাধারণ মানুষেরও তা ভালোই জানা আছে। তাই সংবিধান বদলে জাপানের নতুন করে যুদ্ধে সামিল হওয়ার পদক্ষেপের তারা বিরুদ্ধে।

অ্যাবে-সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ জাপানি জনসাধারণ প্রশ্ন তুলছে, গত সাত দশকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে জাপান যদি উন্নত অর্থনীতির দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে, তবে নতুন করে যুদ্ধবাদী নীতি নেওয়ার কী প্রয়োজন? তাদের প্রশ্ন, এই নীতি কি জাপানের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করবে, নাকি গোটা পূর্ব এশিয়া তথা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে যুদ্ধের উত্তাপকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে? যদি দ্বিতীয়টি ঘটে, তবে তা চীন এবং জাপান, উভয়ের মধ্যেই বিরোধী মনোভাব বাড়াবে এবং তার পিছনে কাজ করবে মার্কিন মদত, যা এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন স্বার্থ, যা চীন-রাশিয়া জোটের পাল্টা হিসাবে জাপান-অস্ট্রেলিয়া-ভারতের সঙ্গে সামরিক বোঝাপড়া গড়ে তুলতে চাইছে, সেই স্বার্থকেই চরিতার্থ করবে। পরিণতিতে পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি উত্তপ্ত হবে। অথচ জাপানের সাধারণ মানুষ চায়, অস্ত্র দিয়ে নয়, দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই জাপান সরকার চীনের সাথে বিভিন্ন দ্বীপের মালিকানা সহ নানা মতভেদের মীমাংসা করুক।

অ্যাবে-সরকারের ভূমিকাকে দেশের সাধারণ মানুষ কোনও মতেই মেনে নিতে পারছে না। এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, দেশের অধিকাংশ মানুষই সরকারের এই নীতি পরিবর্তনের বিরোধী। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জাপানকে যুদ্ধোন্মাদনার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এইখানেই গণতন্ত্রের সংকট। শুধু জাপান নয়, বিশ্বের সব পুঁজিবাদী দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা মূল্য পায় না। সে সব কিছুকেই এখানে ভোটের আকারে বাক্সবন্দি করে রাখা হয়। এই সংকটের মধ্যেই রয়েছে পুঁজিবাদের পতনের কারণ। মানুষ একবার যখন এই সংকটের স্বরূপ ধরতে পারবে, তখন তাকে আর আটকে রাখা যাবে না। আশা করা যায়, জাপানের মানুষের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-স্মৃতি সরকারের যুদ্ধোন্মাদনার স্বরূপ ধরতে সাহায্য করবে এবং তা ঠেকাতে তাদের আরও বেশি করে তৎপর করে তুলবে। এই পরিস্থিতি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জোটের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসে বিহারে সভা

৫ আগস্ট বিহারে মজফফরপুরে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অরুণ সিং প্রমুখ

বহড়ু বিডিওতে বিক্ষোভ

ক্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে ১০ আগস্ট বহড়ু বিডিও অফিসে শত শত কৃষকের উপস্থিতিতে বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অজয় সাহা, জয়নগর কেন্দ্রের বিধায়ক কমরেড তরুণকান্তি নস্কর, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুবীর দাস ও অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

হরিয়ানায় নির্মাণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ

হরিয়ানার নির্মাণ শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন ঝজ্জর জেলার কালেক্টরেট অফিসের সামনে। ২৭ জুলাই এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ভবন নির্মাণ কারিগর মজদুর ইউনিয়নের ডাকে শত শত শ্রমিক সমবেত হয়েছিলেন এই বিক্ষোভে। হরিয়ানা নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডকে বিজেপি সরকার পুনর্গঠিত করেছে, অথচ তাতে শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের রাখা হয়নি। এছাড়া, ঝজ্জরে জেলা হেড অফিসে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিকদের ছুটতে হচ্ছে বহু দূরবর্তী রোহটকে। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে শ্রমিকদের বিশাল মিছিল কালেক্টরেট অফিসে পৌঁছায়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি রামফল, কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার, এআইকেকেএমএস নেতা জয়কিরণ ও কর্তার সিং প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি জগদীশ চন্দ্র। জেলার তহসিলদার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

আসামে কমসোমলের শিক্ষা শিবির

৩০-৩১ জুলাই আসামের কামরূপ, দরং এবং নলবাড়ি জেলাভিত্তিক কমসোমলের এক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শিবির নলবাড়ি জেলার নাট্যমন্দির প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জুলাই সকালে শিবিরে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড ময়ূখ ভট্টাচার্য। এরপর 'বিপ্লবীদের জীবন গাথা' শীর্ষক আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি) দলের নলবাড়ি জেলা কমিটির ইনচার্জ কমরেড প্রোজ্জ্বল দেব।

৩০ জুলাই সন্ধ্যা এবং ৩১ জুলাই সকাল ও বিকালের অধিবেশন পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (সি) আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস। মানব সমাজের অগ্রগতির ইতিহাস এবং উন্নত বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শীর্ষক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন তিনি। এই আলোচনা কিশোর-কিশোরীদের মনে গভীর রেখাপাত করে। এ ছাড়াও দু'দিন ব্যাপী এই শিবিরে ব্যায়াম, প্যারেড, আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ ও যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান, আবৃত্তি, নাচ এবং নাটক মঞ্চস্থ করে কমসোমলের সদস্যরা। ৩১ জুলাই কমসোমলের সদস্যরা নলবাড়ি শহরের প্রধান রাস্তা কুচকাওয়াজ করে প্রদক্ষিণ করে এবং সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে 'গার্ড অফ অনার' জানায়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শিবিরের কাজ সমাপ্ত হয়। শিবিরে মোট ১১০ জন কিশোর-কিশোরী সদস্য অংশগ্রহণ করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও স্বাধিকারের দাবিতে কনভেনশন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ৭২৩ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট কেলেঙ্কারির সংবাদ শিক্ষাপ্রেমী মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। সরকার ও শাসকদলের একের পর এক ফতোয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারও প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে। সেনেট, সিন্ডিকেট, কোর্ট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা নামমাত্র করে দিয়ে সরকার মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে। সংশোধিত বিশ্ববিদ্যালয় আইনে এই সমস্ত ক্ষেত্রেই শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্র প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের উপর নানাভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। এমনকী উপাচার্য ও অন্যান্য পদাধিকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য প্রধান যোগ্যতা হিসাবে প্রাধান্য পাচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের উপর বহিরাগতদের হামলার ঘটনা বেড়েই চলেছে।

২৮ জুলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের দ্বারভাঙা হলে এক শিক্ষা কনভেনশনে এই উদ্বেগের কথা উঠে এল বক্তাদের মধ্য থেকে। অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি (কলকাতা জেলা) এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে এই কনভেনশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার সাথে যুক্ত কলেজগুলির প্রায় তিন শতাধিক অধ্যাপক, গবেষক, অশিক্ষক কর্মচারী, ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্ররা অংশগ্রহণ করেন। অধ্যাপক প্রদীপ দত্ত, অধ্যাপক তরুণ দাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি অরুণ দাস ও গবেষক মৌসুমী পুরকাইতকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করে।

সেভ এডুকেশন কমিটির কলকাতা জেলা সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তীর পেশ করা মূল প্রস্তাবের উপর বক্তারা আলোচনা করেন। অধ্যাপিকা মিরাতুন নাহার, অধ্যাপক পবিত্র গুপ্ত, সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অনীশ রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও জয়নগর কেন্দ্রের বিধায়ক তরুণ নস্কর, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা শুভেন্দু মুখার্জী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। শেষ পর্বে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য সহসাধারণ সম্পাদক সৌরভ মুখার্জী। সভায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গঠিত সাম্পান গোষ্ঠী সঙ্গীত পরিবেশন করে।

১) শ্রম আইনের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী প্রস্তাবিত সংশোধন প্রত্যাহার, ২) কৃষক ও খেতমজুর স্বার্থবিরোধী জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্স বাতিল, ৩) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, ৪) কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, ৫) মূল্য সূচকের সাথে পরিবর্তন সাপেক্ষে ১৫,০০০ টাকা ন্যূনতম মাসিক বেতন, ৬) সমস্ত শ্রমিকের জন্য সামাজিক সুরক্ষা, ৭) সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের জন্য অবসরকালীন সুনিশ্চিত পেনশনের ব্যবস্থা, ৮) সম কাজে সম বেতনের ভিত্তিতে সকল ঠিকা শ্রমিককে স্থায়ী কর্মীদের সমান মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা, ৯) শ্রম আইনগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ, ১০) কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ বন্ধ, ১১) বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের সমস্ত রকম সিলিং প্রত্যাহার, গ্র্যাচুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি, ১২) আবেদনের ৪৫ দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন, আই এল ও কনভেনশন নং ৮৭ এবং ৯৮-কে ভারত সরকারের মান্যতা প্রভৃতি দাবিতে

২ সেপ্টেম্বর

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ এবং
শ্রমিক ফেডারেশনগুলির আহ্বানে

সারা ভারত

সাধারণ ধর্মঘট

সফল করুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org